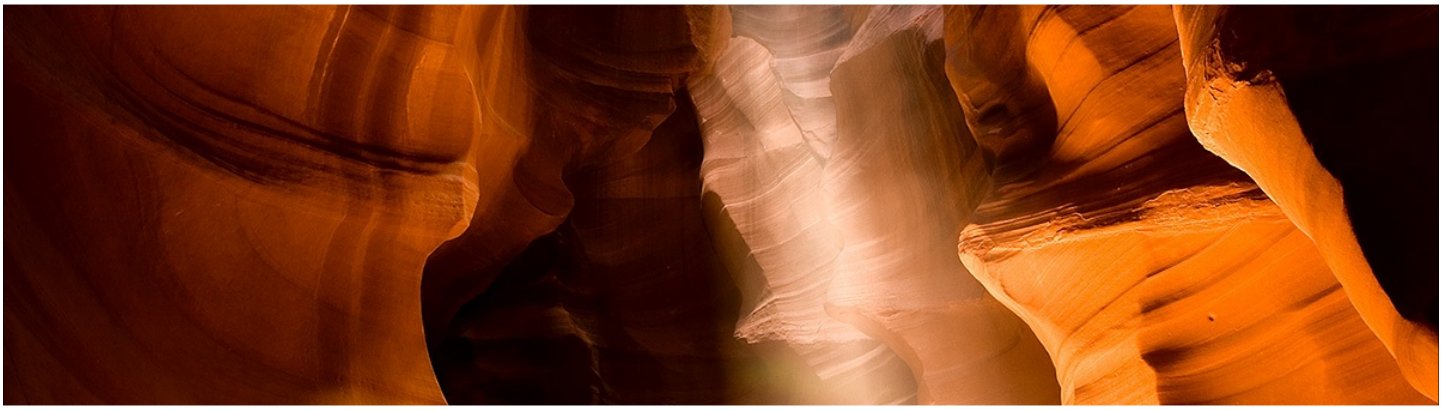

বোনের প্রতি সাইয়্যেদ কুতুবের চিঠিঃ "আত্মার প্রশান্তি"

সাইয়েদ কুতুব

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

আধুনিক মুসলিম বিশ্বে সাইয়েদ কুতুব একটি সুপরিচিত নাম । ইসলামী আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত হলেও তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সমালোচক, কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক। তাঁর ভাষার অতুলনীয় কারুকার্য সব লেখাতেই দ্বীপ্ত হয়ে উঠেছে। ভাবের গভীরতা ও ভাষার বলিষ্ঠতায় তাঁর প্রতিটি রচনা হয়ে উঠেছে অসামান্য।

বর্তমান লেখাটি তাঁর একটি চিঠি । তিনি জেল থেকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁর সেই ছোট বোন আমিনার কাছে।

গুচ্ছ গুচ্ছ একান্ত অনুভূতির গাঁথামালার এই চিঠিটি আরবী পত্র সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এটি ভিন্ন একটি ছোট পুস্তিকা আকারে কয়েকটি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, পত্রের শেষে সাইয়েদ কুতুবের স্বাক্ষর ও তারিখ নেই। সম্ভবত প্রকাশকের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।

-অনুবাদক

১

প্রিয় বোন আমার কিছু একান্ত অনুভূতি তোমাকে উপহার দিচ্ছি...।

মৃত্যুর চিন্তা যে তোমাকে এখনও তাড়িয়ে ফিরছে! সবখানে, প্রতিটি বস্তুর পেছনে তুমি মৃত্যুর উপস্থিতি কল্পনা করছো। তোমার ধারণায়, মৃত্যু এমন এক দুর্দান্ত শক্তি যা কিনা জীব ও জীবনকে আবেষ্টন করে রেখেছে। ভাবছো, মরণের সামনে জীবন একেবারে শক্তিহীন, ভয়ে থরথর কম্পমান!!

কিন্তু, আমিতো দেখছি, জীবনের উত্তাল শক্তিমত্তার কাছে মৃত্যু শক্তিহারা এক পরাস্ত শত্রু মাত্র। জীবন-পাত্র হতে ছিটকে পড়া কিছু টুকরো কুড়িয়ে খাওয়া ছাড়া তার করার কিছু নেই।

বস্তুত আমার চারপাশে জীবনের কলতান ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিটি বস্তু প্রবৃদ্ধি, গতিময়তা ও অগ্রগতির পানে ধাবমান। যেমন, সকল মায়েরা গর্ভধারন করে সন্তান জন্ম দিয়ে যচ্ছেন। অবশ্য এমন প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী সমান। মাছ, পাখি ও কীট-পতঙ্গ, এসব জীবনের উদ্বোধক- ডিম্ব হতে নিয়ত ছুটে আসছে। ফলে-ফুলে সুসজ্জিত বৃক্ষ, লতা-গুল্মে মাটি ফেটে পড়ছে। আকাশমণ্ডল যেন নেমে আসছে বৃষ্টির অঝোর ধারায়, আর ওদিকে উত্তাল তরঙ্গে নেচে উঠছে সমুদ্রের বুক। এভাবে, পৃথিবীর বুকে সবকিছুরই প্রবৃদ্ধি ঘটছে।

মাঝে মাঝে মৃত্যু বিকট শব্দ করে গর্জে উঠে চলে যায়, অথবা ঐ ছিটকে পড়া খাদ্যদানা কুড়িয়ে খাওয়ার জন্য কখনো সামান্য থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু, জীবন তার আপন পথে সদা গতিশীল, প্রাণময় ও চির-চঞ্চল। মৃত্যু সম্পর্কে তার কোন ভাবনা নেই।

আপন দেহে মৃত্যুর আক্রমণ হলে জীবন সাময়িকভাবে বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। কিন্তু ক্ষতস্থান দ্রুত নিরাময় হয়ে ওঠে এবং

বেদনার আর্তি অচিরেই আনন্দে ভরে ওঠে। জীবনের স্পন্দনে ধাবিত হচ্ছে- মানুষ, পশু-পাখি, মাছ, কীট-পতঙ্গ, ঘাস-বৃক্ষ প্রভৃতি। আসলে পৃথিবীর সব কিছুকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে জীবনেরই স্পন্দন। জীবনের এই কোলাহলে মৃত্যু মৃদু গর্জন করে চলে যাচ্ছে অথবা, ছিটকে পড়া □আধার□ কুড়িয়ে খাচ্ছে।

[caption id="attachment_2152" align="alignnone" width="300"] সাইয়্যেদ কুতুবের ছোট বোন আমিনা কুতুব[/caption]

সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, এখানে সেখানে কত জীবনের উদ্বোধন ঘটছে। এমনিভাবে সকল বস্তুর প্রবৃদ্ধি ঘটছে সংখ্যায়, প্রকারে, পরিমাণে ও বৈশিষ্টে। মৃত্যুর কিছু করার থাকলে জীবনের বিস্তৃতি তো থমকে দাঁড়াতো।..... কিন্তু, চঞ্চল জীবনী শক্তির কাছে মৃত্যু তো একটা পর্যুদস্ত, ক্ষীণ শক্তি।.... চীর জীবন্ত আল্লাহর শক্তি□র অন্যতম প্রমাণ হলো জীবনের এই উদ্বোধন ও বিস্তৃতি।

২

আত্মস্বার্থের জন্যে বেঁচে থাকতে চাইলে জীবনটাকে মনে হবে ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ। যার শুরু হচ্ছে প্রথম চিৎকার এবং পরিণতি হচ্ছে, সীমিত আয়ুর পরিসমাপ্তি।

কিন্তু, আমরা যদি অন্যের জন্যে বাঁচতে চাই, অর্থাৎ বিশেষ কোন চিন্তাধারার জন্যে তাহলে জীবনটাকে মনে হবে অত্যন্ত প্রলম্ব ও সুগভীর □ যার প্রারম্ভ হচ্ছে মানবতার সূচনাপর্ব এবং বিস্তৃতি হচ্ছে পৃথিবী প্রস্থানের অনন্ত উত্তরকাল। এই অবস্থায় আমরা ব্যক্তিজীবনকে আমরা অর্জন করি বহুগুণে ও অঢেল প্রাপ্তির মাধ্যমে। এই প্রাপ্তি কিন্তু কল্পনার জগতে নয়, বরং বাস্তবেই। এই জীবনবোধ দিন, সময় ও মুহূর্ত সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরো তীক্ষ্ণ করে তোলে। কারণ, জীবনে বাৎসরিক গণনায় যথার্থ নয়। বরং জীবনের সঠিক হিসাব ও প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে, অনুভবের হিসাব। এ ব্যাপারে বস্তুবাদীরা যেটাকে কল্পনা বলে অভিহিত করে প্রকৃত পক্ষে সেটাই বাস্তব। কারণ, জীবনবোধই প্রকৃত জীবন। কোন মানুষকে জীবনবোধ রহিত করে দেয়া অর্থ হচ্ছে, তার কাছ থেকে জীবন ছিনিয়ে নেয়া। অতএব, জীবন সম্পর্কে মানুষের অনুভুতি যত প্রবল হবে বাস্তবে সে ততো বেশি জীবনকে অর্জন করতে পারবে। আমার ধারণায়, বিষয়টা এত স্পষ্ট যে, নির্বিবাধে তা মেনে নেয়া যায়।

অন্যের জন্য বাঁচার মাধ্যমে আমরা প্রলম্বিত জীবন লাভ করি। অপরের প্রতি আমাদের আবেগ অনুভূতি যত বৃদ্ধি করবো জীবন সম্পর্কে আমাদের অনুভব ততো গভীর ও ঘনই হবে। পরিশেষে দেখা যাবে, এই জীবনটাকে আমরা বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পেরেছি।

৩

অকল্যাণের বীজ কেবল তরঙ্গায়িত হয়ে, বেড়ে ওঠে। কিন্তু কল্যাণের বীজই সুফলতা দান করে। অকল্যাণের বীজ লকলকিয়ে আকাশে ধাওয়া করলেও তার শেকড় থাকে অগভীর মাটিতে। অথচ, আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে, সে কল্যাণের বীজকে আলো-বাতাসের আড়াল করে রাখে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, কল্যাণ-ফলবান বৃক্ষ বড় হতে থাকে ধীরে ধীরে। কারণ তার অন্তঃমূল প্রোথিত অত্যন্ত গভীরে।

বাহ্যিক চাকচিক্যময় অকল্যাণ বৃক্ষের প্রকৃত শক্তি ও দৃঢ়তার অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব, সেটা অনেক দুর্বল ও নড়বড়ে। পক্ষান্তরে, সত্য-সুন্দর বাড়তে থাকে ধীর গতিতে মরু হাওয়া ও বিপদের ঝড়-ঝাপটা সয়ে।

৪

মানুষের আত্মার ভালো দিকটা যদি আমরা স্পর্শ করতে শিখি তাহলে দেখবো, অনেক সুন্দর বস্তু ছড়িয়ে আছে □ হঠাৎ যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

এ ব্যাপারে আমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রচুর। প্রথম চোটে যাদেরকে নিরেট বদমাশ মনে হয় তাদের ব্যাপারেও আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রান্তিকে মেনে নিয়ে তাদেরকে একটু দয়ার স্পর্শ দাও, অল্প হলেও খাঁটি ভালবাসা দাও, তাদের সুখ

দুঃখের অকৃত্রিম সহমর্মিতা প্রকাশ কর.... এভাবে দেখতে পাবে তাদের হৃদয় জগতের কল্যাণ ভাণ্ডার তোমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সামান্য হলেও তোমার হৃদয়ের নিটোল নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বিনিময়ে তারা যখন তোমাকে ভালোবাসা ও আস্থার উপহার পেশ করবে আমার কথার বাস্তবতা তখন যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। যতটা মনে কর- অকল্যাণ কিন্তু মানবআত্মায় ততোটা গভীর নয়। শুধু বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু শক্ত আবরণ প্রয়োজন, অকল্যাণের গণ্ডী ততটুকুই। নিরাপত্তার ছায়া পেলে সেই শক্তাবরণ ভেদ করে উন্মোচিত হয় রুচিকর সুস্বাদু ফল। নিরাপত্তা, নির্ভরতা, দুঃখ-সংগ্রাম ও ক্রুটি বিচ্যুতিতে নিষ্কলুষ মমতা দিয়ে যে মানুষকে ভরিয়ে তুলতে পারে সে-ই কেবল এই সুস্বাদু ফলের সন্ধান পায়। অগ্রসর ভূমিকা নিয়ে, হৃদয়ের প্রশস্ততা দিয়ে এসব বাস্তবায়ন করা যায়। অনেক সময় আশাতীত ফলও পাওয়া যায়। আমি স্বপ্ন ও কল্প জগতের ডানাওয়ালা কোন শব্দোচ্চারণ করছি না, বরং আমার নিজের- একান্ত নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

৫

আমাদের হৃদয়ের যদি প্রেম, মমতা ও সুন্দরের বীজ উপ্ত হয় তাহলে নিজেদের আত্মার ওপর চাপানো অগণিত বোঝা ও কষ্ট লাঘব করতে পারবো। এবং আন্তরিকতার সাথে সত্যিকারভাবে অন্যকে প্রশংসা করতে পারবো, কাউকে অসত্য তোষামোদি করার প্রয়োজন হবে না। কারণ, তাদের হৃদয়ভূমিতে কল্যাণআকর আবিষ্কার করার পর দেখতে পাব- তাদের কাছে প্রশংসাযোগ্য কতো সুকুমারবৃত্তি রয়েছে। আসলে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর প্রশংসাযোগ্য কিছু না কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তাদের জন্য মমতার বীজ উপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা তার সন্ধান পাইনে, বা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

এমনিভাবে, তাদের ব্যাপারে আমাদের সংকীর্ণতাবোধের বিন্দুমাত্র দরকার নেই, কিংবা ক্রুটি- বিচ্যুতির ওপর ধৈর্য ধরার কষ্টও ভোগ করতে হবে না। কারণ, তাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে মমতার বীজ বপনের পর তাদের কোন ছিদ্রান্বেষণ তো করবোই না, বরং তাদের দুর্বলতাকে আমরা দয়া করতে শিখবো। ফলে, স্বভাবতই তাদের প্রতি কোন প্রকার হিংসা বা সদা সতর্কতার ঝামেলায় নিজেদেরকে কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন হবে না। আমরা অন্যকে হিংসা করি কখন? করি, যখন কল্যাণের বীজ আমাদের হৃদয়ে পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না।

ঠিক এমনি, কল্যাণের প্রতি নির্ভরতার ঘাটতি হলে আমরা অন্যকে ভয় ও করি। আপন আত্মায় প্রেম মমতা ও সুন্দরের বীজ বপন করে যখন অন্যকে তা দান করি তখন আমরা অপূর্ব তৃপ্তি ও সুখ অনুভব করি।

৬

আমরা অন্যের চেয়ে পবিত্রাত্মা, পরিচ্ছন্ন প্রাণ প্রশস্ত হৃদয়, কিংবা বেশি বুদ্ধিমান- এসব আত্মগরিমায় নিমজ্জিত হয়ে যখন মানুষকে এড়িয়ে চলি তখন আমরা মহৎ কিছুই করতে পারিনে। ...আমরা যেন এক সহজ ও অনায়াস রাস্তা নির্বাচন করে নিয়েছি।

প্রকৃত মহত্ব হচ্ছে- আমরা ঐ সব লোকদের সাথে উদারতাপূর্ণ প্রাণ দিয়ে মিশবো। আমরা অন্তরের সাথেই কামনা করবো যথাসম্ভব পঙ্কিলতামুক্ত ও সংস্কৃতিঋদ্ধ হয়ে তারা আমাদের পর্যায়ে উঠে আসুক ।

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা আমদের মহৎ জগত ও আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে তাদের কদর্যতার তোষামদি করবো, কিংবা তাদের বুঝিয়ে দেব যে, আমরাই শ্রেষ্ট। বরং প্রকৃত মহত্বের কাজ হবে হৃদয়ের পর্যাপ্ত প্রশস্ততা দিয়ে উভয় মেরুর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা।

৭

শক্তি ও যোগ্যতার নির্দিষ্ট মানে পৌঁছানোর পর আমরা ভাবি, অন্যের কোন সহযোগিতা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। মনে হয়, আমাদের উন্নতির পেছনে অন্য লোকের অবদানের স্বীকৃতি দিলে আমাদের মান ক্ষুণ্ন হবে। ভাবটা এমন, আমরা যেন সব কিছুই নিজেরা করতে চাই; অন্যদের সহযোগিতা নিতে কিংবা তাদের ও আমাদের পারস্পরিক চেষ্টা সাধনার সম্মিলন করতে আমরা আদৌ প্রস্তুত নই। বরং শীর্ষে উপনীত হওয়ার পেছনে তাদের সহযোগিতা ও ভূমিকার কথা মানুষকে বলতে আমরা একপ্রকার সংকীর্ণতাবোধে আক্রান্ত হই। যখন আমাদের তেমন আত্মবিশ্বাস থাকে না- অর্থাৎ কোন একটা দিকে আমরা বাস্তবেই আমরা দুর্বল থাকি তখনই এ সব বাহুল্য চিন্তা করি। কিন্তু, আমরা যদি আদতেই শক্তিসম্পন্ন হই তাহলে এসবের একটুও আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। অবোধ শিশুই কেবল তোমার পরম নির্ভরতার হাত দূরে ঠেলে দিতে চায়।

ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রার সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হলে অপরের সহযোগিতাকে অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবো। কৃতজ্ঞতা এজন্য যে, তারা আমাদের সহযোগিতা দিয়েছে। আর আনন্দ এ কারণে যে, এমনও লোক আছে যারা আমাদের সমবিশ্বাসী, যার ফলে তার শ্রম ও আনুগত্য দিয়ে আমাদের সাথে শরীক হয়েছে। পারস্পরিক অনুভূতির ঐকতানেই রয়েছে পবিত্র উজ্জ্বল আনন্দ।

৮

আমরা আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে কুক্ষিগত করে রাখি, অন্যলোকে সেটা আত্মসাৎ করলে ক্ষুব্ধ হই, বরং নিজেরা সেটা আত্মীকরণের সার্বিক চেষ্টা করি এবং অপরের বৈরিতার পথে কাজ করি। যখন এমন প্রত্যয় ও মূল্যবোধের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকে না, হৃদয়ের গভীরতা হতে উৎসারিত হয় না- তখনই আমরা এসব করি। আমাদের সত্তার চেয়ে বিশ্বাসগুলো অধিক প্রিয় না হলেও এমনটা করি।

যখন আমরা দেখি যে আমাদের চিন্তা ভাবনা ও বিশ্বাস অন্য লোকেও বহন করছে তখন এক অনাবিল আনন্দ লাভ করি। আমাদের মৃত্যুর পরও সেটা যে অন্যের পাথেয় ও পানীয় হিসাবে বিবেচিত হবে হৃদয়ের তুষ্টি, সুখ ও প্রশান্তির জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাতে অন্যে ফায়দা না লুটতে পারে এই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির চর্চা করা কেবল ব্যবসায়ীরাই। কিন্তু যারা চিন্তাবিদ, বিশেষ ভাবধারার পথচারী তাদের সকল সুখ এখানেই যে, সর্বসাধারণ মানুষ তাদের এই চিন্তা বিশ্বাসকে নিজেদের ভেতর বন্টন করে নিক, প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করুক, যেন এই চিন্তা প্রত্যয়টা তাদেরই স্বত্ব।

খাঁটি চিন্তাবিদরা এটা মনে করেন না যে, তারাই এ সব চিন্তা দর্শনের হোতা; তাঁদের ধারণায়, তারা হচ্ছেন এগুলোর অনুবাদ ও প্রচলনের একেকটা মাধ্যম মাত্র। কারণ, তাঁরা যে উৎস হতে এই ভাবনা চয়ন করেছেন সেটা তাদের স্বসৃজিত নয় (বরং সেটা আল্লাহর সৃষ্ট)। অতএব তাঁদের অনাবিল আনন্দের বিষয় হচ্ছে অন্যরাও ঐ মৌলিক উৎসের সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছেন।

৯

সত্য বুঝা ও সত্য অনুধাবন ও তদুভয়ের ভেতর বিস্তর প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে জ্ঞান আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে অভিজ্ঞান!

প্রথমত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা নিছক কিছু শব্দ ও অর্থ, কিংবা কিছু আংশিক ফলাফল ও অভিজ্ঞতার সাথে আদান প্রদান করি। কিন্তু দ্বিতীয়টাতে লেনদেন করি জীবন্ত কতিপয় আহবান ও সামগ্রিক অনুভবের সাথে।

দ্বিতীয়ত প্রথমটাতে আমরা অধিসত্তা হতে জ্ঞান আহরণ করা আমাদের বুদ্ধিকোষে বিশেষভাবে লালন করি। কিন্তু দ্বিতীয়টাতে সত্য উৎসারিত হয় আমাদের সত্তার গভীরতম প্রদেশ হতে; যেখানে আমাদের শিরা উপশিরার মতই ধমণী প্রবাহিত হয়, যার আলোকচ্ছটার সাথে আমাদের প্রতিটা স্পন্দন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত প্রথমটাতে রয়েছে বিভিন্ন শাখা-উপশাখা ও বিচিত্র শিরোনাম। যেমন বিজ্ঞান- যার অধিনে রয়েছে বিভিন্ন প্রকরণ। ধর্ম, এখানে রয়েছে বিভিন্ন শিরোনাম ও প্রকরণ। শিল্প এখানেও রয়েছে অসংখ্য ধারা। কিন্তু দ্বিতীয়টাতে রয়েছে মহা আদি শক্তির সাথে সম্পর্কশীল এক অভিন্ন শক্তি, যেখানে পাওয়া যায় মৌল উৎসের সাথে অনিষ্ট সদা প্রবহমান স্রোতধারা।

১০

মানবিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে আমাদের এমন সব বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন যারা নিজেদের অফিস ও কর্মক্ষেত্রকেই বসতবাড়ি ও সাধনাগার হিসেবে গ্রহণ করবেন। জ্ঞানের যে শাখায় তারা পারদর্শিতা অর্জন করতে চাচ্ছেন সেখানেই তাদের জীবন উৎসর্গ করে দিবেন- কেবলমাত্র ত্যাগের অনুভুতি নিয়ে নয়, বরং উপাসক যেমন অত্যন্ত নন্দন চিত্তে প্রভুর জন্য তার প্রাণ উৎসর্গ করেন সেরকম আনন্দের অনুভূতি নিয়ে।

এতদসত্ত্বেও মনে রাখা দরকার, তারাই কেবল জীবনের দিশা দিবেন কিংবা মানব জাতির জন্য পথ-নির্বাচন করবেন এমন নয়।......

অগ্রপথিকদের সবসময় সর্বোচ্চ প্রাণ শক্তির অধিকারী হতে হয়। কারণ, তাঁদের বহন করা মশালের উষ্ণতাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের

যাবতীয় বীজ অঙ্কুরিত হয়। তার আলোকচ্ছটায় চলার পথ ঝরোকা হয়ে ওঠে এবং সঠিক উপকরণ সংগ্রহের মাধ্যমে মহান উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে।

শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বাস ও কর্মের ভেতর বৈচিত্র্য থাকলেও এদের ভিতর এক অন্তর্নিহিত ঐকতান রয়েছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টির মাধ্যমে অগ্রনায়কেরাই কেবল তা অনুধাবন করতে পারেন। এজন্য, তারা কাউকে বা কোন কিছুকে ক্ষুদ্র ভেবে অবমূল্যায়ন করেন না, আবার অধিমূল্যায়নও করেন না। যারা মহত্বহীন তারা মনে করেন, এসব বিচিত্রময় শক্তির ভেতর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। এবং এঁরাই ধর্মের নামে বিজ্ঞানের কিংবা বিজ্ঞানের নামে ধর্মের বিরোধিতা করেন, কর্মের নামে শিল্পকে কিংবা আধ্যাত্মিক মতবাদের নামে কোলাহলময় জীবনের অবমূল্যায়ন করেন। কারণ, তাদের ধারণায় এইসব শক্তির উৎসমূল অভিন্ন নয়। কিন্তু, মহত্বের অধিকারী নেতৃবৃন্দ এগুলোর ভেতরকার ঐক্য সূত্রটা অনুধাবন করতে পারেন। কারণ, তাদের সম্পর্ক থাকে ঐ মৌল উৎসের সাথে, সেখান থেকেই তারা উপজীব্য সংগ্রহ করে থাকেন। অবশ্য, মানবেতিহাসে এ ধরনের লোকের সংখ্যা নেহাত কমই- বলা যায়- বিরল। তবে, যারাই আছেন তারাই যথেষ্ট। জগত বিস্তারী শক্তি তাদের লালন করেন এবং যথাসময়ে তাদেরকে জাগিয়ে তোলেন।

অলৌকিক-অজানা শক্তির প্রতি নিরেট অন্ধ বিশ্বাসের প্রচণ্ড ভয়াবহতা রয়েছে। এতে মানুষকে কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যায়, জীবনকে বিশাল এক অবাস্তবতার দিকে ঠেলে দেয়।

আবার এমন বিশ্বাসকে একেবারে অস্বীকার করার ভয়াবহতাও কম নয়। কারণ, এতে অজানা বিষয়গুলো যাবতীয় বাতায়ন রুদ্ধ করে রাখা হয়, সকল অদৃশ্য শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। কারণ, ঐ অদৃশ্য শক্তি আমাদের মানবীয় প্রসার সীমিত গণ্ডির অনেক উর্ধ্বে থাকে। থাকে বলেই আয়তন, শক্তি ও মূল্যে সৃষ্টিজগতের কাছে তাকে অনেক ক্ষুদ্র মনে হয়। মানবীয় জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিকে কেবলমাত্র জানার পরিধি দিয়ে আবেষ্টন করতে চায়, অথচ মহান সৃষ্টির তুলনায় সে কতো দুর্বল!!

পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবন হচ্ছে- সৃষ্টি শক্তি অনুধাবনে এক ধারাবাহিক অক্ষমতা, কিংবা ধারাবাহিক পরাঙ্গমতা। তবে, দুর্বিপাক মাড়িয়ে যখন সুদীর্ঘ পথে সামনের দিকে ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হওয়া যায় তখনই এই পারঙ্গমতা অর্জন করা যায়।

যে সব শক্তি রহস্য একদিন মানুষের অধিগম্য ছিলো সময়ের ব্যবধানে তার কোন একটা হয়তো মানুষ উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। এই সফলতাই মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে তাদের কাছে এখনো অনেক বিষয় রয়েছে যা এখনো উদঘাটিত হয় নি। কারণ, সে তো নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে রয়েছে।

মানববুদ্ধির সম্মান করার অর্থ হচ্ছে কল্পলোকের কুসংস্কৃতি সেবকদের মত হাত পা ছেড়ে বসে না থেকে জীবনের অজানা বিষয়গুলোর অর্থ ও রহস্য উদঘাটন করা, এই বিশালায়তন সৃষ্টির মহত্ব অনুধাবন করা, জগতের মাঝে আমাদের মূল্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। এর মাধ্যমে জগতের সাথে আমাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অধিকতর ও উপলব্ধির অগণিত শক্তিময় দরোজা খুলে যায়।

১২

এ যুগের কিছু কিছু লোক মনে করেন □ আল্লাহর নিরঙ্কুশ মহত্ব স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে মানুষকে মূল্যহীন ও ক্ষুদ্র করে দেখা। ভাবটা এমন, সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও মানুষ যেন দুই পরস্পর বিরোধী সত্তা এবং তারা পরস্পর শক্তি ও মহত্বের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ।

আমার মনে হয়, আমরা আমাদের হৃদয়কে আল্লাহর নিরঙ্কুশ মহত্বের অনুভব যত বৃদ্ধি করতে পারবো আমাদের মহত্বও ততোটা বৃদ্ধি পাবে। কারণ আমরা এক মহান প্রভূরই সৃষ্টি।

আসলে, ওসব ব্যক্তিরা যখন হীনমন্যতা হতে নিজেদেরকে উদ্ধার করতে চান তখন তারা এমনভাবে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়েন যে, অত্যন্ত নিকটের নভোমণ্ডল ছাড়া তাঁরা আর কিছু দেখতে পান না।

তাঁদের ধারণা- মানুষ আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিতো যখন তারা ছিলো দুর্বল ও অক্ষম। কিন্তু, এখন যেহেতু তারা শক্তির এক বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়েছে, তাই এখন আর কোন □প্রভূ□র প্রয়োজন নেই। এর অর্থ হচ্ছে□ □দুর্বলতা□ দৃষ্টি খুলে দেয় আর □শক্তি□ সেটাকে হরণ করে নেয়। অথচ মানুষের উচিত ছিলো□ তার শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহর মহত্বের প্রতিও তাঁর অনুভূতি প্রখর হবে। কারণ, বিকশিত শক্তির বদৌলতে সে এই শক্তির উৎসমূলের সন্ধান করতে থাকবে (এবং তখন দেখতে পাবে, সে শক্তির উৎস

হচ্ছেন আল্লাহ)।

আল্লাহর নিরঙ্কুশ মহত্বে বিশ্ববাসীদেরকে কখনো কোন প্রকার দুর্বলতা বা আত্মবিস্মৃতি স্পর্শ করতে পারে না। বরং, তারা আরো সুসংহত সম্ভ্রমবোধে উজ্জীবিত হন। কারণ, তাদের সম্পর্ক হচ্ছে এই জগতে দিগন্ত বিস্তারী মহান শক্তির সাথে। তাঁরা জানেন তাদের মহত্বের বলয় হচ্ছে এই পৃথিবী ও মানুষ। অতএব, মহত্বের প্রশ্নে তাদের সাথে আল্লাহর কোন দ্বন্দ্ব নেই। বিশ্ববাসীদের গভীর প্রত্যয়ের ভেতরই প্রকৃত মহত্ব-সম্ভ্রম নিহিত যারা নিজেদেরকে বেলুনের মত অনর্থক ফুলিয়ে ফাপিয়ে তোলে তাদের ভেতর সে মহত্বের ইমারত নেই।

১৩

স্বাধীনতার আবরণে মাঝে মাঝে গোলামী হারিয়ে যায়। তখন যাবতীয় প্রথার বাঁধনমুক্ত হয়ে অবশেষে এই জগতের মানবতার দায়-দায়িত্ব হতেও মুক্তি ঘোষণা করে।

দুর্বলতা গ্লানির অর্গল হতে মুক্তি এবং মানবতার বেড়ি হতে মুক্তির ভেতর ব্যাপক মৌল পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে প্রকৃত মুক্তি। কিন্তু দ্বিতীয়টা হচ্ছে পাশবিকতা হতে মানবতার উত্তরণের উপায় উপকরণ হতে মুক্তি। এ ধরনের স্বাধীনতা বা মুক্তি প্রকৃত বিচারে পাশবিক প্রবৃত্তিরই দাসত্ব; যে প্রবৃত্তির যাঁতাকল হতে মুক্ত হয়ে মানবিক স্বাধীনতার ফুরফুরে আকাশে উড়ে বাড়ানোর জন্যে মানবতা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করছে।

প্রয়োজনের কথা প্রকাশে মানবাতা সংকোচবোধ করবে কেন? স্বভাবতই তার অনুধাবন করার কথা- প্রয়োজন কে সাথে নিয়ে উন্নততর পর্যায়ে আসাই হচ্ছে মানবতার অন্যতম প্রধান উপাদান। তবে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন থেকে মোহমুক্তির নামই স্বাধীনতা। রক্ত-মাংসের প্রবৃত্তি এবং দুর্বলতা-অপদস্থের ভীতিকে জয় করার অর্থ হচ্ছে মানবতার মর্মকে আরো সুসংহত করা।

১৪

নৈর্ব্যক্তিক মূল্যবোধের প্রচারণায় আমি বিশ্বাস করি না। কারণ, উজ্জীবিক উষ্ণ প্রতীতি ছাড়া মূল্যবোধের স্থিতি নেই। আর মানবহৃদয় ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে সেই ঊষ্ণ ও উজ্জীবক বিশ্বাস!

উজ্জীবনী বিশ্বাস ছাড়া কোন চিন্তাধারা বা নীতিমালা নিছক ফাঁকা বুলি, কিংবা বেশি হলেও প্রাণহীন অর্থমালা। চিন্তাগুচ্ছকে জীবন্ত করে তোলে কেবল হৃদয় উত্থিত ঈমানের দীপ্তি। কোন ভাবধারা বা নীতিবোধ যদি প্রোজ্জ্বল হৃদয়ে উদগত না হয়ে শীত মস্তিষ্কে হয় তাহলে তার প্রতি অন্যেরা কোনদিন প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করে না।

তুমি নিজে প্রথমে তোমার চিন্তাধারার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর- বিশ্বাস কর গভীর উষ্ণতার। শুধু তখনই কেবল অন্যরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। তা না হলে, তোমার চিন্তাধারা হবে জীবন ও প্রাণশূন্য কয়েকটি শব্দপুঞ্জ।

মানবাত্মার রস সিঞ্চিত হয়ে মানুষরূপে পৃথিবীর বুকে জীবন্ত প্রাণী হিসাবে বিচরণ করেছেন- এমন ভাবধারার কোন আয়ুষ্কাল নেই। এমন ভাবে, প্রচুর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার লালিত কোন বিশ্বাসে যার হৃদয় সুশোভিত হয় নি। এমন মানুষেরও কোন অস্তিত্ব নেই।

ব্যক্তি ও বিশ্বাসের পার্থক্য করাটা হচ্ছে দেহ ও প্রাণ, অথবা অর্থ ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য করার মত। এই বিভাজন কখনও হয় অসম্ভব এবং কখনো নিয়ে আসে অপমুক্তি ও নিঃশেষ।

যেসব চিন্তাধারা টিকে আছে সেগুলো আহার সংগ্রহ করছে মানব হৃদয় থেকে। যে সব চিন্তাধারা এমন পবিত্র আহার পুষ্ট হয় নি, তার জন্ম মূলত নিষ্প্রাণ। মানবতাকে এক ইঞ্চিও সামনে এগিয়ে নেবার শক্তি রাখে না। আমার ভাবতে কষ্ট লাগে কিভাবে নিকৃষ্ট মাধ্যমকে আশ্রয় করে আমরা উন্নত লক্ষে উপনীত হতে পারবো। পবিত্র হৃদয় ছাড়া পবিত্র উদ্দেশ্য জীবন্ত হয়ে ওঠে না। সুতরাং সেই পূত হৃদয় কিভাবে কদাকার উপকরণ ব্যবহার করতে পারে? কিভাবে সে ঐ পথ মাড়াতে পারে? কর্দমাক্ত নদীর তীরে গেলে কর্দমাক্ত হয়েই উঠতে হবে। সে কাদার চিহ্ন থাকবে আমাদের পায়ে, আর আমাদের সে পায়ের চিহ্নও থাকবে সে কাদার ওপর। তদ্রুপ, আমরা যদি কোন কদাকার মাধ্যমের আশ্রয় নিই তাহলে তার বিষ্ঠা আমাদের হৃদয়ে লেগে থাকবে। শুধু তাই নয়, আমাদের পবিত্র উদ্দেশ্যকেও কলুষিত করবে।

আত্মিক বিচারে মাধ্যমটা হচ্ছে লক্ষের একটা অংশ, সেখানে মাধ্যম ও লক্ষের ভেতর কোন বিভাজন পাওয়া যায় না। মানবীয় অনুভূতি যখন কোন মহান লক্ষের সন্ধান পায় তখন সে কখনোই বিষ্ঠাযুক্ত মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে না, উপরন্তু একথা ভাবতেও পারে না। উদ্দেশ্য কোন দিন মাধ্যমকে নির্দোষ করে তুলতে পারে না। অথচ, এটা হচ্ছে মহান এক পশ্চিমা দর্শন [তাদের ধারণায়, আপনার উদ্দেশ্য যদি ভালো হয় তাহলে যে কোন খারাপ কাজ করে সে উদ্দেশ্য হাসিল করলেও কোন অসুবিধা নেই□ অনুবাদক]। কারণ তারা বেঁচে থাকে মস্তিষ্ক নিয়ে, হৃদয় নিয়ে নয়। আর মস্তিষ্ক জগতের লক্ষ্য ও মাধ্যমের ভেতর বিভাজন সম্ভব।

১৬

অভিজ্ঞতার আলোকে আমি দেখছি যে, অন্যের হৃদয়ে সান্ত্বনা, তুষ্টি ও আশা নির্ভরতার আলো ছড়ানোর মত নিবিড় আত্মিক সুখ এ জীবনে আর নেই।

এটা এক বিস্ময়কর ঐশী তৃপ্তি যা এ ধরাধামের অন্য কোথাও নেই। এটা যেন আমাদের মানবসত্তায় পবিত্রতম ঐশী সত্তার একান্ত আহবান। সে বাহ্যিক কোন প্রতিদানের আশা করে না। কারণ, প্রতিদান তার আত্মার গভীরেই নিহিত।

এ ব্যাপারে একটা বিষয় নিয়ে কিছু লোক অহেতুক বাড়াবাড়ি করেন, যেটা আসলেই উচিত নয়। সেটা হচ্ছে অন্যের ভালো কর্মের স্বীকৃতি দেয়া।

অপরকে স্বীকৃতিদানের ভেতরে যে মৌলিক সৌন্দর্য আছে, কিংবা উৎসর্গীত প্রাণের যে মহা আনন্দ আছে তা কখনোই অস্বীকার করবো না। এ ব্যাপারটাই অন্যরকম। এখানকার আনন্দটা হচ্ছে এমন যে, কল্যাণটা অন্যের হৃদয়েও ব্যাপক সাড়া জাগাচ্ছে। স্বাভাবিক সহানুভুতির মত এখানে ধন্যবাদ জানানো আশাবাদের কথা শুনানো বা উৎসাহ দয়ার মত নয়। এটা এমনই এক পূত-পাবিত্র ও নির্মল আনন্দ যা আমাদের হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়। বাইরের কোন কার্যকারণ ছাড়াই সে আপন হৃদয়েই ফিরে আসে। তার কারণ, হৃদয়েই তো তার অবস্থান।

১৭

শেষ মুহূর্তে এলেও মৃত্যুকে ভয় করিনে। এ জীবনে আমি নিয়েছি প্রচুর অর্থাৎ আমি দিয়েছি। হৃদয় জগতে নেয়া, দেয়ার অভিন্ন অর্থ হওয়ার কারণে সেখানে দুটোর ভেতর পার্থক্য করা কঠিন। যখনই আমি কিছু দিই, তখনই কিছু নিই। এর অর্থ এই নয় যে, কেউ আমাকে কিছু দিয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে- আমি যতটুকু দিয়েছি ততটুকু নিয়েছি।কারণ, আমার দেওয়ার আনন্দ তাদের নেওয়ার আনন্দের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

ঐ যে বললাম□ শেষ মুহূর্তেও আমি মৃত্যুকে ভয় পাইনে। কারণ, আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ছিল আমি তা করেছি। আমার যদি দীর্ঘায়ূ নসীব হয় তাহলে, আরো অনেক কিছু করার আশা রাখি। কিন্তু সেটা সম্ভব না হলেও আমার আত্মা কষ্ট পাবে না। কারণ আমার দ্বারা সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে অন্যরা সেটা করবে। পরিকল্পিত কর্মগুলো যদি স্থায়িত্বের উপযোগী হয় তাহলে তার অবশ্যই স্ফূরণ ঘটবে। এই সৃষ্টিজগত বিভিন্নভাবে মানুষের বা অন্যের কাছ থেকে যে গুরুত্ব লাভ করে তাতে আমার পূর্ণ তৃপ্তি আছে যে- এখানে কল্যাণকর কোন ভাব-দর্শনের সে মৃত্যু হতে দিবে না।

মুমূর্ষাবস্থায়ও আমি মৃত্যুকে ভয় পাইনে। কারণ, আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করেছি ভালো হতে। আমার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমি অনুতাপ-দগ্ধ। এগুলোকে আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করে তার রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁর দেয়া শাস্তির কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন নই। কারণ, আমি নিশ্চিত যে, তাঁর দেয়া শাস্তি ও প্রতিবিধান যথার্থ ও ইনসাফপূর্ণ। আমার ভালো-মন্দের যাবতীয় কর্মের বোঝা বহনে আমি অভ্যস্ত । তাই, বিচার দিনের ভুল-ত্রুটির সাজা পেতে আমার কোন দুঃখ নেই।

অনুবাদকঃ কামাল আহসান সূত্রঃ খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত □প্রেক্ষণ□, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর □৯৮ সংখ্যা।

সাইয়েদ কুতুব

সাইয়েদ কুতুবের নাম সাইয়েদ, একজন মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠক।। কুতুব তাঁর বংশীয় উপাধি। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরব উপদ্বীপ থেকে এসে মিসরের উত্তরাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী ইবরাহীম কুতুব। ইবরাহীম কুতুবের পাঁচ সন্তান ছিল। সাইয়েদ কুতুব ভাই বোনদের মধ্যে বড়, ইসলমামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ করেন এবং কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় দৃঢ়তার পরিচয় দেন।
সাইয়েদ কুতুব ১৯০৬ সালে মিসরের উসইউত জিলার মুশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আম্মা ফাতিমা গোসাইন উসমান অত্যন্ত দ্বীনদার ও আল্লাহভীরু মহিলা ছিলেন। সাইয়েদের পিতা হাজী ইবরাহীম চাষাবাদ করতেন কিন্তু তিনিও ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ও চরিত্রবান। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইয়েদ কুতুবের শিক্ষা শুরু হয়। মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি শৈশবেই কুরআন হেফয করেন। সাইয়েদ তাজহিযিয়াতু দারুল উলুম মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি কায়রোর বিখ্যাত মাদ্রাসা দারুল উলুমে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে ঐ মাদ্রাসা থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রোণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেই তাঁকে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি পড়া-শুনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। তিনি দুবছরের কোঁস শেষ করে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসেন। আমেরিকা থাকা কালেই তিনি বস্তুবাদী সমাজের দুরবস্থা লক্ষ্য করেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, একমাত্র ইসলামই সত্যিকার অর্থে মানব সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে। আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পরই তিনি ইখয়ানুল মুসলেমুন দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী যাচাই করতে শুরু করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি ঐ দলের সদস্য হয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে মিসরেক স্বাধীনতা দানের ওয়াদা করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ইখওয়ান দল বৃটিশের মিসর ত্যাগের দাবীতে আন্দোলন শুরু কের। এর ফলে তাদের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেড়ে যায়। ১৯৫৪ সালে ইখওয়ান পরিচালিত সাময়িকী-ইখওয়ানুল মুসলিমুন- এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছমাস পরই কর্নেল নাসেরের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। কারণ, ঐ বছর মিসর সরকার বৃটিশের সাথে নতুন করে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন, পত্রিকাটি তার সমালোচনা করে। এবং গ্রেফতার শুরু করেন ইখওয়ানুল কর্মীদের। গ্রেফতারকৃত ইখওয়ান নেতাদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুবও ছিলেন। তাঁকে মিসরের বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত। তাঁর হাতে পায়ে শিকল পরানো হয়। শুধু তাই নয়, সাইয়েদ কুতুবকে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় জেল পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। পথে কয়েকবার বেহুঁস হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে যান। হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলতেনঃ (আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ)। জেলে ঢুকার সাথে সাথেই জেল কর্মচারীগণ তাঁকে মারপিট করতে শুরু করে এবং দুঘন্টা পর্যন্ত এ নির্যাতন চলতে থাকে। তারপর একটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে তাঁর উপর লেলিয়ে দেয়া হয়। কুকুর তাঁর পা কামড়ে ধরে জেলের আঙ্গিনায় টেনে নিয়ে বেড়ায়। এ প্রাথমিক অভ্যর্থনা জানানোর পর একটানা সাত ঘন্টা ব্যাপী তাঁকে জেরা করা হয়। তাঁর স্বাস্থ্য এসব নির্যাতন সহ্য কর আর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর সুদৃঢ় ঈমানের বলে পাষাণ থেকে উচ্চারিত হতে থাকেঃ (আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ) জেলের অন্ধকার কুঠরী রাতে তালাবদ্ধ করা হতো। আর দিনের বেলা তাঁকে রীতিমত প্যারেড করনো হতো। তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বক্ষপীড়া, হৃদপিণ্ডেরদুর্বলতা ও সর্বাঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যাথা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। তবু তাঁর গায়ে আগুনের ছেঁকা দেয়া হতে থাকে। পুলিশের কুকুর তাঁর শরীরে নখ এ দাঁতের আঁচড় কাটে। তাঁর মাথায় খুব গরম পানি এবং পরক্ষণেই বেশী ঠাণ্ডা পানি ঢালা হতে থাকে। লাথি, কিল, ঘুষি, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ইত্যাদি তো ছিল দৈনন্দিন ব্যাপার। ১৯৫৫ সালের তেরই জুলাই, গণআদালতের বিচারে তাঁকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। অসুস্থতার দরুণ তিনি আদালতে হাজির হতে পারেননি। তাঁর এক বছর কারাভোগের পর নাসের সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, তিনি সংবাদ পত্রের মাধ্যমে ক্ষমার আবেদন করলে তাঁকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে। মর্দে মুমিন এ প্রস্তাবের যে জবাব দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি বলেনঃ আমি এ প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি যে, মযলুমকে যালিমের নিকট ক্ষমার আবেদন জানাতে বলা হচ্ছে। আল্লাহর কসম! যদি ক্ষমা প্রার্থনার কয়েকটি শব্দ আমাকে ফাঁসি থেকেও রেহাই দিতে পারে, তবু আমি এরূপ শব্দ উচ্চারণ করতে রাযী নই। আমি আল্লাহ্‌র দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হতে চাই যে, আমি তাঁর প্রতি এবং তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।
পরবর্তীকালে তাঁকে যতবার ক্ষমা প্রার্থনার পরামর্শ দেয়া হয়েছে ততবারই তিনি একই কথা বলেছেন: যদি আমাকে যথার্থই অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমি এতে সন্তুষ্ট আছি। আর যদি বাতিল শক্তি আমাকে অন্যায়ভাবে বন্দী করে থাকে, তাহলে আমি কিছুতেই বাতিলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো না। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফ মিসর যান। তিনি সাইয়েদ কুতুবের মুক্তির সুপারিশ করায় কর্নেল নাসের তাঁকে মুক্তি দিয়ে তাঁরই বাসভবনে অন্তরীণাবদ্ধ করেন। এক বছর যেতে না যেতেই তাকে আবার বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অথচ তিনি তখনও পুলিশের কড়া পাহারাধীন ছিলেন। শুধু তিনি নন, তাঁর ভাই মুহাম্মাদ কুতুব, বোন হামিদা কুতুব ও আমিনা কুতুবসহ বিশ হাযারেরও বেশী লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্রায় সাত শ ছিলেন মহিলা। ১৯৬৫ সালে কর্নেল নাসের মস্কো সফরে থাকাকালীন এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, ইখওয়ানুল মুসলিমুন তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আর এই ঘোষণার সাথে সাথেই সারা মিসরে ইখওয়ান নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক ধরপকড় শুরু হয়। ১৯৬৪ ছাব্বিশে মার্চে জারীকৃত একটি নতুন আইনের বলে প্রেসিডেন্টকে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার,তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ প্রভৃতি দণ্ডবিধির অধিকার প্রদান করা হয়। সাইয়েদ কুতুব ও অন্যান্য আসামীগণ উনিশ শ ছেষট্টি সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বিচার চলাকালে ট্রাইবুনালের সামনে প্রকাশ করেন যে, অপরাধ স্বীকার করার জন্যে তাঁদের উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। ট্রাইবুনালের সভাপতি আসামীদের কোন কথার প্রতিই কান দেননি। ইংরেজী ১৯৬৬ সালের আগষ্ট মাসে সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর দুজন সাথীকে সামরিক ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে মৃত্যুদন্ডাদেশ শুনানো হয়। সারা দুনিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কিন্তু পঁচিশে আগষ্ট, ১৯৬৬ সালে ঐ দন্ডদেশ কার্যকর করা হয়।
সাইয়েদ কুতুব মিসরের প্রখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিকদের অন্যতম। শিশু সাহিত্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা। ছোটদের জন্যে আকর্ষণীয় ভাষায় নবীদের কাহিনী লিখে তিনি প্রতিভার পরিচয় দেন। শিশুদের মনে ইসলামী ভাবধারা জাগানোর জন্যে এবং তাদের চারিত্রিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তিনি গল্প লিখেন। পরবর্তীকালে আশওয়াক (কাটা) নামে ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট একখানা উপন্যাস রচনা করেন। পরে ঐ ধরণের আরও দুটো উপন্যাস রচনা করেন। একটি তিফলে মিনাল ক্বারীয়া (গ্রামের ছেলে) ও অন্যটি মাদিনাতুল মাসহুর (যাদুর শহর)।
তাঁর রচিত গ্রন্থাবলির বিবরণ মাঝে রয়েছে: (১) (কুরআনের আঁকা কেয়ামতের দৃশ্য)। কুরআন পাকের ৮০ টি সূরার ১৫০ স্থানে কেয়ামতের আলোচনা রয়েছে। সাইয়েদ বিপুল দক্ষতার সাথে সেসব বিবরণ থেকে হাশরের ময়দান, দোযখ ও বেহেশতের চিত্র এঁকেছেন। (২) আল- কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য। ২০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থখানায় সাইয়েদ কুতুব কুরআনের ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভঙ্গীর আলোচনা করেছেন। (৩) ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার। এ পর্যন্ত বইখানার ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বইখানা অনুদিত হয়েছে। (৪) তাফসির ফি যিলালিল কুরআন। সাইয়েদ কুতুবের এক অনবদ্য অবদান। আট খন্ডে সমাপ্ত এক জ্ঞানের সাগর। ঠিক তাফসীর নয়- বরং কুরআন অধ্যয়নকালে তাঁর মনে যেসব ভাবের উদয় হয়েছে তা-ই তিনি কাগজের বুকে এঁকেছেন এবং প্রতিটি আয়াতের ভিতরে লুকানো দাওয়াত সংশোধনের উপায়, সতর্কীকরণ, আল্লাহর পরিচয় ইত্যাদি বিষয়ে নিপুণতার সাথে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (৫) ইসলাম ও পুঁকিবাদের দ্বন্দ। (৬) বিশ্বশান্তি ও ইসলাম। (৭) সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি। (৮) ইসলামী সমাজের চিত্র। (৯) আমি যে আমেরিকা দেখেছি। (১০) (চার ভাই বোনের চিন্তাধারা)। এতে সাইয়েদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব, আমিনা কুতুব ও হামিদা কুতুবের রচনা একত্রে সংকলিত হয়েছে। (১১) নবীদের কাহিনী। (১২) (কবিতা গুচ্ছ)। (১৩) সমাজ বিপ্লবের ধারা।
পুস্তক লেখার জন্যেই মিসর সরকার সাইয়েদ কুতুবকে অভিযুক্ত করেন ও ঐ অভিযোগে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়। মিসরে সামরিক বাহিনীর পত্রিকা তাঁর বিরুদ্ধে অতীত অভিযোগের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাতে যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ লেখক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সমাজ এবং মার্কসীয় মতবাদ উভয়েরই তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি দাবী করেন যে, ঐসব মতবাদের মধ্যে মানব জাতির জন্য কিছুই নেই। তাঁর মতে বর্তমান দুনিয়া জাহেলিয়াতে ডুবে গেছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের জায়গায় অন্যায়ভাবে মানুষের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয়ে গেছে। লেখক কুরআনের দৃষ্টিভংগীকে পুনরুজ্জীবিত করে সে জাহেলিয়াতকে উচ্ছেদ করার উপর জোর দেন এবং এ জন্যে নিজেদের যথাসর্বস্ব কুরবানী করে দেয়ার আহবান জানান। তিনি আল্লাহ ব্যতীত সকল শাসনকর্তাদের তাগুত আখ্যা দেন। লেখক বলেন তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে ঈমানের শর্ত। তিনি ভাষা, গাত্রবর্ণ, বংশ, অঞ্চল ইত্যাদির ভিত্তিতে ঐক্যবোধকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে ঐক্য গড়া এবং এ মতবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করার জন্যে মুসলিমদের উস্কানী দিচ্ছেন। লেখক তাঁর ঐ পুস্তকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, সারা মিসরে ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করা ও প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা পেশ করেন।